কাশিম বাজারের ডাচ সমাধি

জীবন ঘোষ

ভ্রমণ ও লিখন তাঁর পাশাপাশি চলে সেই সদ্য-তারুণ্যের দিনগুলি থেকে। এখন দশটা পাঁচটা'র জীবন থেকে অবসর নিলেও পুরনো অভ্যাস বজায় রেখেছেন। সুযোগ পেলেই চলে যান পাহাড়ে, জঙ্গলে, এদেশে ছড়িয়ে থাকা ছোট-বড় ঐতিহাসিক জনপদগুলিতে। কদিন আগে হঠাৎ করে ঘুরে এলেন কাশিমবাজার। এবারের সংখ্যায় সেই অভিজ্ঞতার বিবরণ...।

এপথে গিয়েছি অনেকবার। প্লাটফর্ম ছাড়িয়ে রেলগাড়ি যখনই গড়িয়েছে উত্তরে, লেভেল-ক্রশিংয়ের গায়ে নজরে পড়েছে প্রাচীন সমাধি ক্ষেত্র। প্রতিবারই মনে হয়েছে এবার হ'ল না, সামনের বার ঠিক নেমে পড়ব। কিন্তু হয় আর না। কখনও সাথীদের অনাগ্রহে, কখনও বা অসময়ে পাড়ি দেওয়ায়। আর যত না হয়, ততই বাড়ে আগ্রহ। অজানাকে জানার, অচেনাকে চেনার, অদেখাকে দেখার ব্যকুলতা ক্রমশ ভারি হয়। এবার তাই মনের সঙ্গে হয়েছে একটা দারুন সন্ধি। পা জোড়া ঠিক করেছে নেমেই পড়বে লাফিয়ে। সেইমত গোছগাছ করে এক সকালে শিয়ালদহ থেকে চড়েছি লালগোলা এক্সপ্রেসে।

গোটা কয়েক নদী - চূর্ণী, জলঙ্গী, পাগলাচণ্ডী পেরিয়ে পলাশী। নদীয়া শেষ। শুরু হল জেলা মুর্শিদাবাদ। আরও খানিক এগিয়ে কাঁচালঙ্কার রাজত্বে বিখ্যাত নাম বেলডাঙ্গার ঝাঁঝ সামলে গাড়ি থামল বহরমপুর। জেলার সদর শহর। হঠাৎ করে হালকা হয়ে গেল কামরা। গাদাগাদি, ঠেসাঠেসি যাত্রীদল, নানা কিসিমের হকার। ফল-মূল, চা-বিস্কুট, ঘুগনি–মুড়ি, ছুরি–কাঁচি, বাদাম-কটকটি, ইত্যাদি কত কী। কীযে নেই বলা মুশকিল। তাদের অহরহ যাতায়াত। এরই সাথে নিজস্ব গান। সব মিলিয়ে হৈহৈ-রৈরৈ কাণ্ড। ভালো করে পাশের জনের কথা শোনাই দায়। ঝুপ করে কেমন জানি সব চুপচাপ। এতক্ষণ দাপিয়ে বেড়াচ্ছিল যে হাততালি পার্টি, তারাও নেমে গেল। মহার্ঘ বসার জায়গা অবহেলায় গড়াগড়ি খাচ্ছে। শরীর এলিয়ে দিয়েছে পড়ে থাকা যাত্রীরা। একটু বেশি সময় দম নিয়ে আবার দুলে উঠল গাড়ি।

ছোট ন্যাপস্যাকটা কাঁধে চাপিয়ে উঠে দাঁড়াই। গিন্নী বলেন 'চললে কোথা? আমরা তো নামব

এর পরের ষ্টেশন।' কন্যা বলে 'বুঝেছি, সমাধি দেখবে। আমরাও যাব।' উত্তরের অপেক্ষা না করে মা, মেয়ে দুজনে পৌঁছে যায় কামরার দরজায়। যথাসময়ে মৃদু ঝাঁকুনি দিয়ে থমকে দাঁড়ায় রেলগাড়ি। অনেকের সাথে নেমে পড়ি প্ল্যাটফর্মে। অপেক্ষাকৃত শান্ত চত্বর। লোকজনের ভিড় ততটা নয়। সামনেই পুরানো আমলের ষ্টেশন মাস্টারের ঘর, টিকিট কাউন্টার। পাশেই প্ল্যাটফর্ম ছাড়ার পথ তার মাথায় এবং ওপাশের গোল টিনের ফলকে গোটা গোটা করে লেখা 'কাশিমবাজার'।

ধুমায়িত চা সহযোগে হাল্কা জলখাবার শেষ হতেই দোলা লাগল বলরামের টোটোয়। মাঝ বয়সী বলরাম নামা ইস্তক জোঁকের মত লেগে রয়েছে। অনর্গল বুলি। ভাবখানা এমন কাশিমবাজার তার হাতের মুঠোয়। একবার উঠলেই সারা অঞ্চল পাক খাইয়ে হাজির করবে এখানে। আমরা যত বলি অত ঘোরার দরকার নেই, শুধু সমাধি যাব। তাতে তার সায় নেই। আবার সওয়ারি ছেড়ে যাবেও না। শেষমেশ কপট রাগ দেখাতে রাজি হয়। যাত্রা হল শুরু। ছোট শহর। অপরিসর পথঘাট, পুরানো বাড়িগুলোর বেশির ভাগের অবস্থা জরাজীর্ণ। এখানে সেখানে অপরিকল্পিত ভাবে গজিয়ে উঠেছে নয়া ইমারত। টোটোর একটানা ভেঁপু, অটোর কালো ধোঁয়া, রিক্সার প্যাঁক প্যাঁক, ধুলোর আস্তরণ সব মিলিয়ে মোটেই সুবিধের নয় নগরের ছিরিছাঁট। তবে এর ইতিহাস বড় মজবুত। সেই ইতিহাসের টানেই কলকাতা থেকে ১৮৫ কিমি দুরের এই প্রান্তে ছুটে আসে কিছু মানুষ।

অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ায় মুর্শিদকুলি খাঁ, ঢাকার পাততাড়ি গুটিয়ে, ভাগীরথীর তীরে মুখসুসাবাদে স্থাপন করেন বাংলার নতুন রাজধানী। তাঁর নামানুসারে রাজধানীর নাম হয় মুর্শিদাবাদ। এর অনেক আগে থেকেই রাজধানীর গায়ের গঞ্জ কাশিমবাজারে ইউরোপীয় বনিকদের যাতায়াত। কাশিমবাজারের নাম নিয়ে নানান মত প্রচলিত আছে। কোথাও বলা হয়েছে নামের উৎসে আছে সৈয়দ কাশিম নামে জনৈক ফকির। আবার অনেকে বলছেন কাশিম নামে এক পীর সাহেবের দরগা আছে এই অঞ্চলে, তার থেকেই এই নাম। অন্যদিকে বড় রাজবাড়ির উত্তর পুরুষ সোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দীর কথায় পর্তুগীজ দমনকারি মোঘল সেনাপতি কাশিমের নামানুসারে এই প্রাচীন জনপদের নাম রাখা হয় কাশিমবাজার। সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে

ওলন্দাজ বনিকদের কুঠি গড়ে ওঠে কাশিমবাজারে। এরপর একে একে পর্তুগীজ, ফরাসী, ইংরেজ এবং ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বানিজ্যস্বার্থে এখানে কুঠি তৈরি হয়। সেইসময় রেশম, হাতির দাঁতের শিল্প, বালুচরি সিল্কের কাপড়, কাঁসা পিতল শিল্প, ডাচ টাইলস এবং সর্বোপরি আফিমের ব্যবসায় রমরমা ছিল কাশিমবাজারের বানিজ্য কেন্দ্রে। পরবর্তী সময়ে চতুর ইংরেজদের চক্রান্তে অন্য সকলে তল্পিতল্পা গোটাতে বাধ্য হয় এবং চলতে থাকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির একাধিপত্য। আরও পরে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমপাদে ভাগীরথী নদী গতিপথ পরিবর্তন করে। নগর থেকে প্রায় তিন মাইল দূরে চলে যায় নতুন প্রবাহপথ। প্রাচীন জাহাজঘাটার চারপাশ বদ্ধ জলায় পরিণত হয়। এরও আগে থেকে ম্যালেরিয়া রোগের আক্রমণ এবং চাষবাসের অবনতি

প্রভৃতি কারণে জনবসতি কমতে থাকে, ধীরে ধীরে ঝোপ জঙ্গল গ্রাস করে নগর সভ্যতা। কাশিমবাজারের গৌরব ক্রমশ অস্তমিত হতে থাকে।

উচুঁ রেললাইন টপকে টোটো এসে থামে সমাধিক্ষেত্রের গেটে। পাশেই ভারতীয় পুরাতত্ব সর্বেক্ষণ দপ্তরের বিজ্ঞপ্তি 'অষ্টাবিংশ শতাব্দীতে যাঁহারা কালিকাপুরে ওলন্দাজ ব্যবসায়ী রূপে বাস করিতেন তাহাদের ৪৭ জনের মরদেহ এই স্থলে সমাহিত আছে।' এই সমাধিক্ষেত্রের উত্তর দিকে কালিকাপুর গ্রামে ছিল ডাচদের কারখানা। জানা যায় একসময় প্রায় ৭০০ / ৮০০ জন শ্রমিক কাজ করত এই কারখানায়। সেই কারখানার আজ আর কোন অস্তিত্ব নেই। ওয়ারেন হেস্টিংসের এক ফরাসী বন্ধু জর্জ লুই ভারনেট ১৭৫৬ সালে ছিলেন এই কারখানার সর্বময় কর্তা। ইংরেজদের কাছ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য মীরজাফর ওলন্দাজদের সঙ্গে হাত মেলায়। ১৭৫৯ সালে বিদারার যুদ্ধে ইংরেজদের কাছে ডাচেরা চূড়ান্ত ভাবে পরাজিত হয়। এর ফলে ডাচেরা উপমহাদেশীয় বানিজ্যে পিছু হটতে থাকে। তারও প্রায় পঞ্চাশ বছর পর উনবিংশ শতাব্দীর একেবারে গোড়ায় ওলন্দাজরা এদেশ ছেড়ে চলে যায়। আরও পরে ১৮২৪ সালে ইংরেজ ও নেদারল্যান্ড সরকারের চুক্তির পর সমস্ত ডাচ কুঠির ভার ইংরেজরা নিয়ে নেয়।

বর্তমানে পাঁচিল দিয়ে ঘেরা আয়তকার এই সমাধি ক্ষেত্রের পূর্বে রেলওয়ে লাইন, দক্ষিণে পাকা সড়ক, উত্তরে ও পশ্চিমে সাধারণ নাগরিকদের ঘরবাড়ি। কোন পাহারার ব্যবস্থা নেই। যে কোন সময় প্রবেশ করা যায় এবং নিজের মত করে সময় কাটান যায়। সমাধি গুলোর উপর ফলক নেই। দু চারটে থাকলেও পাঠোদ্ধার সম্ভব নয়। সরকারী ভাবে কোনও লেখা জানিয়ে বুঝিয়ে দেওয়ার মত পরিদর্শকের দেখা মেলে না। স্মৃতিসৌধগুলির গড়ন ভারী সুন্দর। কোনটি চতুর্ভুজ, কোনটি গম্বুজ আকারের, কোনটি শঙ্কুর আকৃতি, সবচেয়ে সুন্দর সমাধিটি উপাসনা মন্দিরের মতো। ইন্টারনেটের তথ্য ঘেঁটে জানা যায় ন'মিটার উঁচু সাদা রঙের সমাধিটি টেমর ক্যান্টন ফিসারের, তৈরি হয়েছে ১৭৭৮ সনে। সমাধি ক্ষেত্রটি কার্যকরী ছিল ১৭২১ থেকে ১৭৯২ সাল অবধি। প্রথম সমাধি দ্যানিয়েল ভ্যান দার মূলের এবং সর্বশেষ সমাধি জন কান্ট হুটের। সিমেন্টে বাঁধানোপথ বাহারি গাছপালায় ঘেরা ছোট এই সমাধি ক্ষেত্র। যদিও সঠিক দেখভালের অভাবে ক্রমশ ক্ষয় হতে শুরু করেছে ঐতিহ্যবাহী স্মৃতিসৌধগুলি। অনেক জায়গায় প্লাস্টার খসে যাচ্ছে, গড়ন আলগা হয়ে পড়ছে। একইসাথে অবাক লাগে, সেই সব অবিবেচক মানুষের কথা ভেবে যারা স্মৃতিসৌধের দেওয়াল জুড়ে নিজেদের নাম-ধাম ইত্যাদি লিখে রাখে! কবে যে আমরা প্রকৃত অর্থে সভ্য হব? ওদিকে টোটোর ভেঁপু সমানে বাজছে। ডাক দিয়েছে বলরাম। এবার ফেরার পালা। বিদায় ডাচ ব্যবসায়ী। তোমরা শান্তিতে ঘুমাও।